The story *of a* rural outpost *and a* school:

Mohanganj Pilot High School, Bangladesh

By Indrajit Roy, Toronto, February 2026

কংশ পাড়ের কিছু টুকরো স্মৃতি

কংশ নদের এই ছবিগুলো দেখে শৈশবের ঝাপসা হয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো আবার উজ্জ্বল হয়ে ফিরে এলো। আমাদের ছোটবেলার মোহনগঞ্জ ছিল একটি ঘুমন্ত জনপদ, শুধুই একটি বাজার। ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ রেল লাইনের সর্বশেষ স্টেশন, যেখান থেকে হাওড় বিধৌত ভাটি বাংলার শুরু। বাজার এবং স্টেশনটির প্রসিদ্ধি ছিল মাছের জন্য। ভোর বেলায় ঝাপিঁতে ভরে জেলেরা হরেক রকমের মাছ আনতো দূর গন্তব্যে চালানের জন্য। সারাদিনে ট্রেন আসত তিন-চারটি, ইঞ্জিনগুলো ছিল স্টিমচালিত। ট্রেন থামার পর পরই ইঞ্জিনগুলো চলে যেত দূরের একটি শেডে। সেখানে কংশ নদ থেকে পাম্প করে জল ইঞ্জিনের ট্যাঙ্কিতে ভরা হত। ট্যাঙ্কি ভরে গেলে কর্কশ সিটি বাজিয়ে হুশ-হাশ শব্দ করে ইঞ্জিন রওনা হত গোলাকৃতির একটি ঘূর্নায়মান প্যাডের দিকে। এটি ছিল "লুপ লাইন" (loop line), যেখানে ইঞ্জিনের মাথা ঘুরিয়ে প্রস্তুত করা হত ফিরতি যাত্রার জন্য।

আমাদের কাছে এই লুপটি ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিরাট মার্ভেল, অবাক হয়ে দেখতাম এবং উপভোগ করতাম। এই ট্রেনগুলো ছিল আমাদের প্রধান আকর্ষন, একটি ছেড়ে গেলে আরেকটির জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুনতাম। পাকিস্তান পূর্ব রেলওয়ের রেল ব্যবস্থাপনা ছিল অনবদ্য। ট্রেনগুলো আসত সময়মত, বগিগুলো থাকত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বিনা টিকেটে ভ্রমন ছিল প্রায় দুঃসাধ্য ও ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের স্কুলটি রেলস্টেশনের পাশেই। দুপুরের ট্রেনটি আসত যখন আমাদের টিফিনের সময় হত। যাত্রীরা নেমে গেলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর খালি বগিগুলোতে প্রায়ই আমি, আমার বড় দাদা রনজিৎ, গোলাপদা, নুরুল আমিন ভাই, জব্বার, মোস্তাক (কাবুলে কর্মরত জাতিসংঘের সাবেক উর্ধতন কর্মকর্তা), আবুনি (প্রয়াত কথাশিল্পী হুমায়ুন আহমেদের ছোট মামা মাহবুবুন্নবী শেখ) আতাহার ও আরো অনেকে মিলে চুটিয়ে আড্ডা মারতাম। কিন্তু এটা বেশিদিন সম্ভব হয় নি। স্টেশন মাস্টার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলে বাংলার শিক্ষক শামসুল হুদা স্যারকে দায়িত্ব দেয়া হয়। স্যারের কঠোর নজরদারির মুখে আড্ডা দেয়ায় ভাটা পড়ে। কিন্তু এ কারণে শামসুল হুদা স্যার "টিটি স্যার" সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ রকম নিকনেম ছিল ইংরেজির শিক্ষক আজিজ স্যারের। স্যার ছিলেন নম্র প্রকৃতির। কাউকে সহজে বেত্রাঘাত করতেন না, বড়জোর কান মচলে দিতেন। কিন্তু স্যার ছিলেন বেজায় মোটা। তাই ইংরেজির আজিজ স্যারের নাম হয়ে গিয়েছিলো "টেবলেট আজিজ" স্যার।

আমরা যারা পাইলট হাই স্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম, তাদের বিষয়টি জানা ছিল। কিন্তু অন্য স্কুল থেকে যারা ষষ্ট শ্রেনীতে ভর্তি হয়ে আসলো তাদের অনেকেই জানতো না, "টেবলেট আজিজ" স্যারের আসল নাম নয়। এদেরই একজন ছিলো মদন, খুব সম্ভবত সিংধা স্কুল থেকে আসা। একদিন অংকের শিক্ষক ব্রজেন্দ্র স্যার জিগ্যেস করলেন, তোদের পরের ক্লাস কার। মদন হাত তুলে সোৎসাহে বলে উঠল টেবলেট আজিজ স্যারের। আর যায় কোথায়। ব্রজেন্দ্র স্যার ছিলেন ভীষণ

রাশভারী প্রকৃতির। অগ্নিশর্মা হয়ে বেল টিপে দপ্তরিকে জালিবেত আনতে বললেন। বেশ কয়া জালিবেতের আঘাতে মদনের নাস্তানাবুদ অবস্থা হয়ে উঠেছিলো। বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ ছিল আমাদের স্কুল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যেদিন ফল প্রকাশ হবে, সেদিন সকাল থেকেই স্কুল প্রাঙ্গনে এসে খড়ের গাদার ওপর বসে দোদুল্যমান চিত্তে অপেক্ষা করতাম। দ্বিতীয় শ্রেনী থেকেই প্রথম স্থান অধিকার ফলে ক্লাসে ফার্স্ট হওয়াটা একটি বদ নেশায় পরিনত হয়েছিল। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বী মোস্তাক মূর্তিমান আতঙ্কের মত উপস্থিত হয়।

সবসময় তটস্থ থাকতাম কখনা না ও আমার প্রথম স্থানটা কেড়ে নেয়। দিনের শেষে সূর্য্য যখন অস্তাচলগামী, তখন প্রধান শিক্ষক শামসুল হক স্যার সারা দিনের হিসেব শেষে তাঁর কক্ষ থেকে বের হয়ে যখন গম্ভীর স্বরে ফল ঘোষণা করতেন,....হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট এন্ড প্রমোটেড টু ক্লাস.....,তখন বুকের ওপর থেকে পাথর নেমে যেত। নেচে নেচে বাড়ী ফিরতাম। এভাবেই এল সন ১৯৭০। নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন। নবম শ্রেনী থেকে দশম শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু নতুন বছরের ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৫ শে মার্চের ভয়াল রাত, পাক সেনাদের বর্বর হত্যাজ্ঞ। লাখ লাখ দেশান্তরী মানুষের মিছিলে আমাদেরও সীমান্ত পেড়িয়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ। রুঢ় বাস্তবতার আঘাতে আমাদের শৈশব হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল। জীবনের চাকা দ্রুত নিয়ে গেল দূরদেশে,জন্মভূমি মোহনগঞ্জ জায়গা নিল স্মৃতিতে।

লোহিয়ার মাঠ

১৯৪৭ সালে বৃটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গের জনগণের উন্নতির সোপান বেয়ে উপরে ওঠার স্পৃহা তীব্রতর হয়ে ওঠে। এর ঢেউ এসে লাগে মোহনগঞ্জের মত ঢিমে তালে চলা প্রান্তিক সামন্তপ্রথার কৃষিভিত্তিক জনপদগুলোত। পরিবর্তনের আকাঙ্খা ছিল প্রচন্ড, কিন্তু এগুবে কি দিয়ে? জমি-জামা যা ছিল তার প্রায় সবই ছিল জমিদার-জোতদার, বড় ভূস্বামীদের দখলে। অধিকাংশ কৃষকই ছিল ভূমিহীন, বর্গাচাষী, দিনমজুর, কেউ ছিল মৎস্যজীবি-জেলে; কেউ করত মুদির দোকান, ক্ষুদে ব্যবসা - গ্রামের হাটবাজারগুলোতে কৃষকের কাছ থেকে ধান, পাট কিনে আবার দিনান্তে সামান্য লাভের বিনিময়ে ফরিয়া-পাইকারদের কাছে বিক্রি করে কিছু নগদ আয় করতো। পেশাজীবি চাকুরীজীবি শ্রেণির বিকাশ তখনো শুরু হয় নি। বাজার ব্যবস্থায় নগদ অর্থের ঘুরপাক ছিল খুবই সীমিত, এবং এ কারণে অর্থনীতির আকার ছিল খুবই ছোট। কারণ একেবারে সরল ভাষায় অর্থনীতি চলে এভাবে: তোমার খরচ আমার আয়, আমার খরচ তোমার আয়। সাধারণ জনগণের নাগালে নগদ অর্থ খুব বেশি না থাকায় অর্থের হাত বদলও হত কম, তাই স্থানীয় গ্রামীন অর্থনীতি ছিল একেবারেই খোরপোষের অর্থনীতি (ইংরেজিতে "সাবসিস্টেন্স ইকোনমি")। এ ধরনের অর্থনীতি একই জায়গায় চক্রাকারে ঘুরপাক খায়, এর আকাশের দিকে উল্লম্ফনের জন্য প্রয়োজন একটি জিনিসের, তার নাম বিনিয়োগ। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে মোহনগঞ্জে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে সেদিকেই মোড় নিতে শুরু করে যখন মাড়োয়ারী কোম্পানী "লোহিয়া এন্ড কোং" ও এ রকম আরো দু একটা ছোটখাটো কোম্পানী মোহনগঞ্জকে দেশের পাট ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করে।

এদের উদ্যোগে মোহনগঞ্জে রেল স্টেশন, বাজার ও শিয়ালজানি খাল বরাবর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে পাট ক্রয়, বিপনন ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাত করণের কারখানা। নিজেদের জায়গা থেকে ছেড়ে দেয় শিল্প সংস্কৃতি চর্চার জন্য এক বড় প্রান্তর, যা "লোহিয়ার মাঠ" নামে মোহনগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গড়ে তুলে সারিবদ্ধ টিনশেড ভবন, যা "কুলি লাইন" নামে পরিচিতি লাভ করে। এভাবেই মোহনগঞ্জ পরিণত হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিকাশমান পাট শিল্পের (সে আমলে একমাত্র রপ্তানীযোগ্য পণ্য) সাপ্লাই চেইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে প্রসার লাভ করে পাটের চাষ এবং এ অঞ্চলের কৃষকরা নগদ অর্থের মুখ দেখতে শুরু করেন। এরই ছোঁয়া লাগে শিক্ষা বিস্তার ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায়।
আমাদের ছোটবেলার মোহনগঞ্জের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সিংহভাগ জুড়েই ছিল লোহিয়া জুট কোম্পানি ও লোহিয়ার মাঠ। মোহনগঞ্জের যা কিছু সত্য, সুন্দর তার সবটাই আবর্তিত হয়েছে লোহিয়ার মাঠকে ঘিরে। এই মাঠেরেই এক কোণায় গড়ে ওঠে মোহনগঞ্জের প্রথম শহীদ মিনার। এই মাঠেই ষাটের দশক থেকে মোহনগঞ্জের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে সারাদেশ জুড়ে যখন গণ-আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, তখন লোহিয়ার মাঠই হয়ে ওঠে

মিটিং, মিছিল ও শ্লোগানের কেন্দ্রভূমি। আজো মনে পড়ে এ মাঠে অনল-বর্ষী বক্তব্য রেখেছেন তৎকালীন প্রখ্যাত ছাত্র নেতা গোলাম এরশাদুর রহমান, তাজুল ইসলাম, বারী ভাই, নরোত্তমদা ও আরো অনেকে। এখানে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন বাংলার অগ্নিকন্যা, তিনি তখন ন্যাপের রাজনীতি করতেন। এসেছিলেন কুঁড়েঘর প্রমোট করতে, কিন্তু কে জানতো কালের চক্রে নৌকায় পা রাখবেন। সত্তর এর নির্বাচনের প্রাক্কালে এ মাঠেই বঙ্গবন্ধুকে সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে অনেক কিছুর মতই লোহিয়ার মাঠটি ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যায়।

মোহনগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল

মোহনগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমার পিতা ছিলেন এই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করা প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের একজন। ১৯৬২ সালের কোন এক সকালে বাবার হাত ধরে হাই স্কুল কম্পাউন্ডে অবস্থিত প্রাইমারী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেনীতে ভর্তি হই। তখন থেকেই মোহনগঞ্জ পাইলট হাই স্কুলের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্কের সূচনা। ছোট বেলা থেকেই হাই স্কুলের অনেক স্যার আমাকে চিনতেন। ১৯৩১ সালে পূর্ববঙ্গের হাওর জলাভূমির ধার ঘেঁষে খরস্রোতা কংশ নদীর পাড়ে মোহনগঞ্জ নামের এক জনপদের নিভৃত এক পল্লীতে এলাকার কয়েকজন বরেণ্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি মিলে স্কুলটির গোড়াপত্তন করেন। স্কুলটির মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাজিহাটি গ্রামের বনেদি পরিবারের খানসাহেব আব্দুল আজিজ আহম্মদ। তিনি কচুয়ারচরের জহিরুদ্দিন মাস্টার, আলোকদিয়ার নিমাই বেপারী, মানশ্রীর মির্জা আব্দুল আজিজ ও নওহালের সাদত মীরসহ এলাকার আরও বিশিষ্টজনদের সাথে মিলে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে টেঙ্গাপাড়ায় মোহনগঞ্জ জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে জহিরুদ্দিন মাস্টারকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ১৯৩১ সালে এটিকে উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। সে সময় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঢাকা বোর্ডে বিপুল পরিমাণে মঞ্জুরি প্রদান করতে হতো। মোহনগঞ্জের নিমাই বেপারী এই মঞ্জুরির পুরো টাকাটা প্রদান করায় তাঁকে এবং তার অবর্তমানে তার পরিবারের যে কোনও একজন সদস্যকে আজীবন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

খানসাহেব আব্দুল আজিজ আহম্মদের সুযোগ্য সন্তান ছিলেন প্রখ্যাত আওয়ামি লীগ নেতা, বঙ্গবন্ধুর সহচর, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংঘটক, জনাব আব্দুল মমিন (স্বাধীন বাংলাদেশে খাদ্যমন্ত্রী)। এ বাড়ীরই মেয়ে হাসি (সাহানা খাতুন) ছিল আমার সহপাঠিনী। হাসির বড় ভাই রফিক ছিলেন আমার বড় দাদার ক্লাসমেট। রফিক ভাইয়ের বড় ভাই ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন "নন্দন"। তাকে মনে আছে, তিনি স্কুল মাঠে ক্রিকেট খেলতেন।

কালক্রমে স্কুলটি ১৯৬০ দশকের গোড়ার দিকে "পাইলট হাই স্কুলে" রূপান্তরিত হয়। এই "পাইলট" অভিধাটি সংযোজনের সূত্রপাত তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের (পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশে) যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তা-পুষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার আধুনিকায়ন করার বৃহৎ উদ্যোগের অংশ। ১৯৫০ দশকের শেষ ও ১৯৬০ এর দশক ছিল পাকিস্তানে মার্কিন বৈদেশিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ কাল। দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব মোকাবেলা এবং গণতান্ত্রিক উন্নয়ন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শীতল যুদ্ধের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল শিক্ষা ক্ষেত্রকে। মার্কিন সরকার মূলত: ইউএসএআইডির মাধ্যমে ১৯৪৮ সাল থেকে পাকিস্তানের শিক্ষা খাতে ৭.৯ বিলিয়ন ডলার উন্নয়ন সহযোগিতা বিনিয়োগ করে। এই বিনিয়োগের সিংহভাগ প্রবাহিত হয় ১৯৫০-১৯৬০ কাল পর্বে। এই সহযোগিতার আওতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো "পাইলট হাই স্কুল প্রোগ্রাম" (অন্য নাম ছিলো Comprehensive Pilot High Schools initiative)। এই প্রোগ্রাম পাকিস্তানের উভয় অংশে কিছু নির্ধারিত মাধ্যমিক স্কুলকে "মডেল" বা "পাইলট" স্কুলে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়। মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (USAID) এবং সরকারের সাহায্যপুষ্ট সংস্থা ফোর্ড ফাউন্ডেশন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন, ব্যবহারিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ইংরেজি-মাধ্যমের শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম সম্প্রসারিত করে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করা।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে ফোর্ড ফাউন্ডেশন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৫-২০ টি মাধ্যমিক স্কুল বেছে নিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন (গবেষণাগার, গ্রন্থাগার), শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম উন্নয়নে বিনিয়োগ শুরু করে। এই নির্বাচিত স্কুলগুলোর মাঝে আমাদের মোহনগঞ্জ হাই স্কুল ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যে মাপকাঠিতে এটি সম্ভব হলো, তা হল মার্কিন

সরকারের অগ্রাধিকার ছিল অবহেলিত গ্রামীন অঞ্চলের স্কুলগুলোকে প্রাধান্য দেয়া। এ মাপকাঠিতে মোহনগঞ্জ সহজেই উপরে উঠে আসে। পাইলট হাই স্কুলে উন্নীত হওয়ার সুফল মিলতে থাকে ষাটের দশকের গোড়া থেকেই। এ সময় আমাদের স্কুল থেকে অনেকেই ঢাকা বোর্ডে স্ট্যান্ড করেন এবং পরবর্তীতে কর্মজীবনে সাফল্য ও প্রতিভার ছাপ রেখেছেন।

পাইলট স্কুল প্রোগ্রামে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের ভূমিকা ছিল অবকাঠামো উন্নয়নে আর ইউএসআইডি-পিস কোরের (USAID and Peace Corps Integration) ভূমিকা ছিল কারিগরী সহায়তা প্রদানে, পরামর্শক নিয়োগে এবং শিক্ষকদের যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদানে। এর আওতায় আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মরহুম শামসুল হক স্যার যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৬১ সাল থেকে শুরু করে মার্কিন পিস কোরের স্বেচ্ছাসেবকরা, যাদের শিক্ষাগত মূল বিষয় ছিল জীববিজ্ঞান বা শিক্ষাদান, তাদের পূর্ব পাকিস্তানের পাইলট স্কুলগুলোতে এডভাইজার হিসেবে নিয়োগ দেয়া শুরু হয়। তাদের কাজ ছিল বিজ্ঞান শিক্ষায় সহায়তা প্রদান।

এরকম একজন এডভাইজার আমাদের স্কুলেও নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে আসেন ১৯৬৩-১৯৬৫ সালের কোন এক সময়ে। আমি তখন হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র; ক্লাস টু-থ্রিতে পড়তাম। তখনকার দিনে পাইলট হাই স্কুলে ভৌত অবকাঠামো গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ষাট দশকের প্রথম দিকে টেঙ্গাপাড়া খালের পাড় ঘেষেঁ ছিল তিনটি দালান। মূল গেট দিয়ে ঢুকলে প্রথম ভবনটি বিজ্ঞান ভবন, মাঝেরটি ছিল প্রশাসনিক ভবন, যেখানে ছিল প্রধান শিক্ষকের অফিস ও কার্যালয় এবং সবার শেষেরটি ছিল মূলত শ্রেণী কক্ষ। এই ভবনটির ডানের শেষ কক্ষটি ছিল আমেরিকান এডভাইজারের অফিস। তাকে যখন প্রথম দেখলাম, একজন শ্বেতবর্ণের তরুণ যুবক, খুব কৌতুহল হল। আমার প্রয়াত দাদা, রনজিৎকে একদিন তার নাম জিজ্ঞেস করায়, সে নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল ওর নাম গেরি বোল্ড। কেন যেন নামটি মনে গেঁথে যায়, কখনো ভুলতে পারিনি। তারপর প্রায়ই তার অফিস কক্ষের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করতাম তিনি কি করছেন। তিনিও ভিতর থেকে কাঁচের জানালার কাছে এসে মৃদু হেসে হাত নাড়াতেন। এভাবেই তার সাথে এক ধরনের সখ্যতা হয়ে যায়। আমার আগের লেখাগুলোয় তার প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু শুধু নামটি ছাড়া, তাও ইংরেজি বানান ভুল, আর কিছু বলতে পারি নি। এ কারণে ইন্টারনেটে সার্চ করার সময় তাকে খুঁজে পাই নি। তারপর ইংরেজি বানান নানাভাবে পরিবর্তন করে তার সন্ধান পেয়েছি। উদ্দেশ্য ছিল, তার লেখা কোন রিপোর্ট থাকলে তা থেকে আরো অজানা তথ্য আহরণ করা। কিন্তু এতদিনের পুরোনো রিপোর্টগুলো ডিজিটাইজ না করার কারণে এগুলো ইন্টারনেটে নেই। যেটুকু জানতে পেরেছে, শুধু ব্যক্তিগত তথ্য।

আমার দেখা সেই তরুণ মার্কিন এডভাইজারের নাম ছিল গেরি ডিন বোল্ট (Gary Dean Boldt)। তিনি ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কানজাস রাজ্যের ইউলিসিস গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্ম নেন। পারিবারিক খামারেই তার বেড়ে ওঠা। ১৯৬৩ সালে তিনি কানজাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও গণিতে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি মার্কিন পিস কোরে যোগদান করেন। বোল্ড ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬১-১৯৬৩ সালে আসা মার্কিন পিস কোরের ২৯ সদস্যের প্রথম ব্যাচের একজন, যাদের পরিচিতি ছিল (East Pak 1) নামে। আমাদের স্কুলে অবস্থানকালে বোল্ড যেসব কাজ করেছিলেন, তার মাঝে ছিল শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, স্থানীয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান , এবং USAID-র তত্বাবধানে কর্মপরিকল্পনা ও ফলাফল মূল্যায়ন। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের ১৯৬৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে ৪৫,০০০ ডলার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের "education extension centers and pilot schools" খাতে, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল নেত্রকোণার মত গ্রামীণ জেলাগুলোতে এডভাইজার নিয়োগ দেয়া। আমার দেখা গেরি ডিন বোল্ড ছিলেন সেই এডভাইজার। ১৯৬৫ সালে বোল্ড যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান এবং পিস কোর থেকে অব্যাহতি নিয়ে পিতার অনুরোধে পারিবারিক খামারে কৃষিকাজে লিপ্ত হন।

আমেরিকান পাইলট স্কিম আর প্রধান শিক্ষক শামসুল হক স্যারের আমেরিকায় প্রশিক্ষন গ্রহনের কারণে স্কুলটি অনেকটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পরিণত হয়েছিল। শামসুল হক স্যারকে কখনো ইংরেজি ছাড়া আদেশ-নির্দেশ দিতে দেখা যায় নি, স্কুলের দাপ্তরিক কাজকর্ম হতো ইংরেজিতে।আজো মনে আছে স্যার নোটিশ লিখতেন চোস্ত ইংরেজিতে। প্রাইমারী স্কুলের স্যারেরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারতেন না। সহপাঠীদের কথা লিখতে গিয়ে আভার (মাকসুদা হোসেন) কথা কেন জানি

সবার আগে মনে পড়ে। কারণ ও কোন সাধারন মেয়ে ছিল না ষাটের দশকে ওদের বাড়ীটা মোহনগঞ্জের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ওস্তাদ মালু মিয়া ও দুলাল কাকা এই প্রগতিমনস্ক বাড়ীটির ওপর নির্ভর করেই মোহনগঞ্জের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড জাগিয়ে রাখতেন। বাবা ডাক্তার মোশাররফ হোসেন ছিলেন এলাকার ভীষণ জনপ্রিয় ডাক্তার। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। কতবার যে তাঁর কাছে আদরের কানমলা খেয়েছি, তার কোন হিসেব নেই। বড় দুভাই – গোলাম আহমদ (মতি মিয়া) ও সাঈদ আহমদ (জীতু মিয়া) – প্রথম দিককার ঝানু সিএসপি অফিসার। তাই আভার মাঝে এক ধরণের অভিজাত-অভিজাত ভাব বিরাজ করতো। চেহারা ভীষণ আকর্ষণীয় - দীর্ঘাঙ্গি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পিঠের ওপর ছড়ানো সুবিন্যস্ত ঘনকালো কোকড়ানোঁ চুল, টানা টানা চোখ।

আমাদের স্কুলে কাছের-দূরের অনেক গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত – টেঙ্গাপাড়া, দৌলতপূর, দেওথান, বাম, বড়তলী, বানিহারী, খুরশিমূল, তেতুঁলিয়া, নাকডরা, মাইলোড়া, বড়কাশিয়া, মাঘান, মানশ্রী, পেরিরচর, গরুয়াকান্দা, চেঁচড়াখালী, খালিয়াজুড়ী, ভাড়েরা-বানিয়াগাতি, সমাজ, সহিলদেও, সাতুর, পাবই, কাজিয়াটি, পানুর, নওহাল, বিরামপুর, ধারাম, মল্লিকপূর, আলোকদিয়া, চন্দ্রপুর, সিংধা, জোয়ালভাঙ্গা, বামেরচর, কচুয়ারচর, সামাইকোনা। আরো ছিল হাওর জলাভূমির গহীনে অবস্থিত গ্রামগুলো যেমন গাগলাজুর, হাটনাইয়া, জৈণপূর, আনফির, করাচাপুড়, কুলপতাক এবং আরো অনেক গ্রাম, যেগুলোর নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে না। সহপাঠিরা ছিল মোস্তাক, আবুনি, রব্বানী, কালাম, জ্যোতির্ময়, নির্মল, নিরঞ্জন, মোশাররফ, আতাহার, আশু, শ্যামলাল, সুকোমল, জব্বার, বোরহান, মঞ্জু, এবং আরো অনেকে। সহপাঠিনীরা ছিল আভা, রেখা, হাসি, মনোয়ারা, জাহানারা, দুই বোন ইসমত আরা, রফফাত আরা, তুলনা। আরো ছিল সার্কেল অফিসারের অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা কুমকুম, তার বড় বোন মায়া পড়ত দাদাদের সঙ্গে।

দেশ বিভাগের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও সমাজ জীবনে এর রেশ থেকে যায় অনেক দিন। এই রেসিডুয়্যাল ইনফ্লুয়েন্স উত্তরণকালে সমাজ পূনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রটির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও টেক্সট বইয়ের কিছু পরিবর্তন ছাড়া বৃটিশদের রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠদান পদ্ধতিতে তেমন কোন পরিবর্তন আনা হয় নি। এর প্রভাব থেকে যায় ষাট দশকের মাঝামাঝি, যার প্রতিচ্ছবি দেখেছি আমাদের শিক্ষকদের মাঝে। ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা, এর লক্ষ্য, ফোকাস, স্বাধীন দেশের জন্য কতটা যুগোপযোগী তা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু মেধা ও মননের কর্ষণ, এর বিকাশ এবং উৎকর্ষতা ও সৃজনশীলতা যদি হয় বিবেচ্য বিষয়, তা হলে বৃটিশ ঔপনিবেশ শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন দেশে যে দ্রুত তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলবে তা বলা যাবে না।দেশে-বিদেশে নন্দিত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ কুদরত-এ-খোদা, প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ও বাংলাদেশের কৃষি গবেষণার পথিকৃৎ ডঃ কাজী এম বদরুদ্দোজা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার ঊষালগ্নে ঘাতকদের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবি-সূর্য্যসন্তানরা এই বৃটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর দিয়েই উঠে এসেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর থেকে ঐ মাপের ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরো বহু দিন।

টেকনিক্যাল কমপিটেন্স, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, পাঠদানে আন্তরিকতা, শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরাগ, যে কোন মাপকাঠিতেই আমাদের শিক্ষকরা আজকের প্রজন্ম থেকে অনেক উপরে উতরে যাবেন। তাই স্যারদের স্মরণ করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, তাঁদের একজনকে আরেকজন থেকে কিভাবে আলাদা করব? প্রতিটি মাপকাঠিতেই তাঁরা ছিলেন স্ব-স্ব মহিমায় উজ্জ্বল। প্রধান শিক্ষক শামসুল হক স্যারের নেতৃত্বে স্কুলে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, গুণ ও পান্ডিত্যের অধিকারী শিক্ষক মন্ডলীর সমাবেশ ঘটে। যুগের পরিবর্তন হলেও এই কিংবদন্তী শিক্ষকদের এলাকার মানুষ মনে রেখেছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তাঁরা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। এঁদের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে স্কুলের মেধাবী ছাত্ররা এসএসসি পরীক্ষায় চমক সৃষ্টিকারী সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখে। ষাট দশক জুড়ে আমার ছাত্ররা ঢাকা বোর্ডে মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করতে থাকে। দেশের সুপরিচিত কৃষি বিজ্ঞানী ড: সদরুল আমীন ১৯৬৫ বা ১৯৬৬ সালে মোহনগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল থেকে কৃষি বিভাগে ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান দখল করেন।

সহকারী প্রধান শিক্ষক অতুল কৃষ্ণ শর্মা সরকার স্যার ছিলেন ব্রিটিশ ধারার উৎকৃষ্ট প্রতিভূ। অতুল স্যারকে বেশিদিন পাই নি। কোঁচ দিয়ে ধূতি ও পাঞ্জাবি পরিহিত স্যার যখন পরীক্ষা চলাকালীন সময় বেত হাতে নিয়ে রাউন্ড দিয়ে বেড়াতেন, সেটা ছিল রীতিমত ভয় সৃষ্টিকারী। নকলের চিন্তা ছিল এক ভয়ংকর দূঃস্বপ্ন। হাই স্কুলে ওঠার কিছুদিনের মাঝেই অতুল স্যার অবসর নেন। উপ-প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন কুতুব উদ্দিন স্যার। এবার ফিরে যাই প্রধান শিক্ষক শামসুল হক স্যারের কাছে। স্যার নবম-দশম শ্রেণীতে ইংরেজির ক্লাস নিতেন। স্যার তাঁর প্রখর পান্ডিত্য, বাগ্মিতা ও অসাধারণ কঠোর শাসন (এডমিনিস্ট্রেটিভ রিগর) প্রয়োগ করে মোহনগঞ্জ পাইলট হাই স্কুলকে ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম সেরা বিদ্যাপিঠে পরিনত করেন। প্রথম দিকে স্যার ছিলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। একদিন সাহস সঞ্চয় করে স্যারের কামরার সামনে গিয়ে ভারী পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিতেই কোন কিছুতে মগ্ন স্যার মাথা তুলে আমার দিকে অগ্নিঝরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন কি চাই? আমি মিন মিন করে বললাম একটি আবেদনপত্রে আপনার অনুমোদন প্রয়োজন। তিনি ভেতরে আসতে বললেন। আমি দরখাস্তটি স্যারের সামনে মেলে ধরলাম। স্যার দ্রুত চোখ বুলিয়ে দরখাস্তে সই করে যখন আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন তখন ইংগিত ছিল যে ভবিষ্যতেও আসা যাবে। এভাবেই শামসুল হক স্যারের কাছে একসেসিবিলিটি বাড়তে থাকতে থাকে। অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আমাদের আলাদা করে বিশেষ কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়। স্যার মাঝে মাঝে আমাদের ইংরেজি ক্লাস নিতেন। ক্লাসে আমার পারফরমেন্স স্যারকে আকৃষ্ট করে। কৃতিত্বের সঙ্গে ৪৫ টাকা মূল্যমানের রেসিডেনসিয়েল বৃত্তি নিয়ে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। এরপর থেকে আমার সাহস দ্রুত বেড়ে যায়। একদিন বেশি নম্বর পাওয়ার আশায় নোটবই বাদ দিয়ে নিজেই একটা শর্ট প্যারাগ্রাফ ইংরেজিতে লিখে স্যারকে দেখাতে স্যারের বাসায় চলে যাই। একটু অবাক হয়ে স্যার রাইটআপটি আমার হাত থেকে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়লেন এবং কিছু ভুল সংশোধন করে দিয়ে বললেন ভাল লিখেছিস। এরপর থেকে যা লিখবি আমাকে দেখাবি। এ ভাবেই প্রধান শিক্ষক শামসুল হক স্যারের বাসার দরজা আমার জন্য অবারিত হয়ে যায় l

বাংলা পাঠদানে কিংবদন্তী শিক্ষক ছিলেন মতি স্যার (মতিউর রহমান, বাড়ী ধরমপাশায়)। স্যারের ছেলে শিবলী ভাই আমাদের চার-পাঁচ বছরের অগ্রজ ছিলেন। বাংলার শিক্ষক হিসেবে মতি স্যারের সুখ্যাতি সারা নেত্রকোণা মহকুমায় ছড়িয়ে পড়েছিল। স্যারকে প্রাইমারী স্কুল থেকে চিনতাম, হাই স্কুলে ওঠার পর স্যারকে বেশিদিন দেখি নি, খুব সম্ভব তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ষষ্ট-সপ্তম শ্রেনীতে বাংলা পড়াতেন মোস্তফা স্যার (গোলাম মোস্তফা), এরপর আসেন রাজ্জাক স্যার (নওহাল গ্রাম)। এই স্যার ছিলেন ভার্সেটাইল, সব কিছুতেই তাঁর ছিল ক্রিয়েটিভ এপ্রোচ। বাংলার পাশাপাশি স্যার ইংরেজিও পড়াতেন। স্যারকে সবসময় দেখা যেত অত্যন্ত সপ্রতিভ ও এনার্জেটিক। তিনি মতি স্যারের রেখে যাওয়া বাংলা পাঠদানের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যান। এটা শুধু বইকেন্দ্রিক, মুখস্ত-নির্ভর ছিল না, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবৃত্তি, সংগীত ও নাট্যকলার চর্চা। আমার এখনও মনে আছে, কি করে শক্ত গাথুঁনির বাংলা বাক্য লিখতে হয়, তার উদাহরণ এইভাবে দিয়েছিলেন, "লোকে বলে আমি সঙ্গীত পছন্দ করি না। সাপেও সুর ভালবাসে। আমিতো মানুষ"। সারা জীবনের জন্য স্যারের এই উক্তিটি আমার মনে গেঁথে আছে।

মোস্তফা স্যার ছিলেন শান্ত ধীর প্রকৃতির, ধৈর্য্য সহকারে বুঝিয়ে দিতেন। বেত্রাঘাত তো দূরের কথা, কাউকে চড় থাপ্পর দিয়েছেন বলে ও মনে পড়ে না। পক্ষান্তরে রাজ্জাক স্যার ছিলেন বেতের প্রতি বড়ই আসক্ত। তাঁর বেত্রাঘাতে সবাই জর্জরিত হয়েছি। সমস্যা ছিল মেয়েরা। ক্লাশ শেষ হলে ওরা কোনার বেঞ্চটি থেকে ওঠে স্যারদের পিছু পিছু হেঁটে কমনরুমে যেত। আবার নতুন ক্লাশের ঘন্টি বাজলে স্যারদের পিছু পিছু হেঁটে ক্লাশে আসত। রাজ্জাক স্যার ছিলেন মেয়েদের নালিশের প্রতি খুবই সাসসেপ্টিবল। আজকের যুগ হলে এটাকে বলা যেত "জেন্ডার-সেনসিটিভ এপ্রোচ"। এদের কেউ যদি রাজ্জাক স্যারের কাছে নালিশ করতো, "স্যার অমুকে আমার ওড়নায় টান মাড়ছে", তাহলেই তার ওপর নেমে আসতো বেত্রাঘাতের খড়গ। এজন্য কোন ক্লাশের পর রাজ্জাক স্যারের ক্লাশ থাকলে বড়ই আতঙ্কিত থাকতাম ওরা স্যারের কাছে আমার নামে কোন নালিশ করেছে কিনা। নবম-দশম শ্রেনীতে বাংলা পড়াতেন শামসুল হুদা স্যার, যাঁর কথা আগে বলেছি। সিনিওরিটির তালিকায় তাঁর অবস্থান ছিলো সহকারী প্রধান শিক্ষক কুতুব উদ্দিন স্যারের পর। মাঝারি গড়নের সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরিহিত শশ্রুমন্ডিত শামসুল হুদা স্যারের কথা মনে পড়লে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর সদা হাসিমুখ। স্যারের বড় ছেলে আমাদের চার বছরের অগ্রজ সংস্কৃতিমনা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মাহবুব ভাই; ছোট ছেলে মাসুম আমার অনুজ। স্যার পড়াতেন বাংলা প্রথম পত্র -সাহিত্য। প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ ও মর্মার্থ ব্যাখ্যায় স্যারের জুড়ি ছিল না। ছাত্রদের মাঝে জনপ্রিয়তায় স্যার ছিলেন শীর্ষে।

আমাদের স্কুলটি পাইলট হাই স্কুল হওয়ার কারণে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর ছিল বিশেষ জোর। পাইলট স্কিমের আওতায় স্থাপন করা হয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত বিজ্ঞান গবেষণাগার, যেখানে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজিতে প্র্যাকটিকাল ক্লাস নেয়া হত। আজকের যুগ হলে এটিকে বলা হতো "সায়েন্স এনেক্স"। ল্যাবরেটরি পরিচালনার জন্য ছিলেন একজন তরুণ প্রশিক্ষিত ডেমোনস্ট্রেটর, নাম খুব সম্ভব আব্দুর রশীদ (বাড়ী বামেরচর)। গণিত বিষয়ে শিক্ষা দানে যে স্যারেরা কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তারাঁ হলেন - নলিনী কিশোর ঘোষ, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র সরকার, কুতুব উদ্দিন, গোলাম কিবরিয়া, আবুল হোসেন, আবু জাহেদ। এ ছাড়া আরো কয়েকজন শিক্ষক গণিতের ক্লাশ নিতেন, তাঁদের নাম মনে পড়ছে না। নলিনী স্যার ছিলেন অত্যন্ত স্মার্ট ও রাজ্জাক স্যারের মতই সপ্রতিভ। পড়তেন ধূতি, পাঞ্জাবী। কিন্তু স্যারকে আমরা বেশিদিন পাইনি। ১৯৬৬-৬৭র দিকে নলিনী স্যার দেশ ত্যাগ করেন। এরপর উচ্চতর গণিতে পাঠদানের সিংহভাগ দায়িত্ব এসে পড়ে ব্রজেন্দ্র স্যারের ওপর। স্যার পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি পড়াতেন। পাটিগণিত পাঠদানে স্যার কঠোরভাবে "যাদব বাবুর ক্লাসিক্যাল" পাটিগণিতের এপ্রোচ ফলো করতেন। যেমন, "একটি শামুক পিচ্ছিল বাঁশ বয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। কিছুক্ষণ উঠে পিছলে নিচে নেমে আবার উঠতে শুরু করল। এ রকম করতে করতে শামুকটি কতক্ষণে বাঁশের আগায় পৌছবে"- এ ধরনের অঙ্ক পাটিগণিতের নিয়ম মেনে স্টেপ-বাই-স্টেপ লজিক্যাল থিংকিং-এর মাধ্যমে করতে হতো। বীজগণিতের সমাধান পদ্ধতি ব্যবহার করা নিরুৎসাহিত করা হতো। কারণ অজানা ফ্যাক্টরের জন্য "এক্স" বসিয়ে সমীকরন সাজিয়ে সহজেই সমাধান করা যায়। স্যার অত্যন্ত যত্ন করে আমাদের জ্যামিতির কঠিন সূত্রগুলো শিখিয়েছেন। ষষ্ট-সপ্তম শ্রেনীতে আমাদের অঙ্ক-বীজগণিত পড়াতেন আবু জাহেদ স্যার। তিনি ছিলেন লম্বা আকৃতির, সব সময় স্যারকে প্যান্ট ও তার ওপর সাদা হাফ শার্ট পড়তে দেখেছি। স্যারের বাড়ী ছিল দূরে, ধারাম বা মল্লিকপুর। সাইকেলে চড়ে আসতেন। স্যারের মুখে সব সময় সরল হাসি লেগে লাগত। স্যার খুব কমই মারধোর করতেন। পরীক্ষায় নম্বর দানে এই স্যার খুবই জেনারাস ছিলেন।

পাঠদানের পাশাপাশি জোরদার হয় নানাবিধ পাঠ্যক্রম বহির্ভূত (extra-curricular activities) কার্যক্রম। খেলাধূলা, স্কাউট ও শরীরচর্চা কার্যক্রম গুরুত্ব লাভ করে। এর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন সিংধার আজিজ স্যার (আব্দুল আজিজ শাহ্)। সহপাঠী মোস্তাক ছিল স্কাউট, আমাদের অগ্রজ সাতুরের এনায়েত ভাই ছিলেন স্কাউটের নেতা, তার উজ্জ্বল ছবি এখনো মনে গেঁথে আছে। স্কুলের মাঠটি অবারিত ছিল যাত্রাগান, পালাগান, জারীগান, নাটক এবং সংস্কৃতির অন্যান্য অনুষঙ্গগুলো চর্চার। এসবে বাধা দেওয়া ত দূরের কথা, সবাই উৎসাহিত করেছে। আমাদের স্কুল জীবনের পুরোটাই ছিল বাঙালীর স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রতিবাদ মিছিল, ধর্মঘটে মুখর।
১৯৬২ সালে যখন ক্লাস টুতে পড়ি, তখন শুরু হয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন। ১৯৬৬ সালে আসে ছয় দফা – পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে বাঙালির মুক্তির সনদ। এর আদায়ের দাবীতে তীব্রতর হতে থাকে ছাত্র আন্দোলন, এর জের ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুরু।

দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
Sunday, March 20, 1966
Monday, March 21, 1966

আওয়ামীলীগ কাউন্সিলে ৬ দফা অনুমোদন

দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান

আওয়ামী লীগ সভাপতি পদে শেখ মুজিব

'কনভেনশন লীগই প্রকৃত জাতীয়তাবাদী'
—প্রেসিডেন্ট আইয়ুব

লিউ শাও চী'র পাকিস্তান আগমন

বঞ্চিত বাংলার সন্তান হিসাবে ৬-দফার সংগ্রামী ভাইদের কাতারে সৈনিক হতে চাই

১৯৬৮ সালে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলো বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবীতে গড়ে তুলে দূর্বার ছাত্র আন্দোলন। ১৯৬৯ সালে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। নতুন শ্লোগান "জয় বাংলা" ধ্বনিত হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার গ্রামে গঞ্জে। বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে শাণিত করার জন্য উত্থিত হতে থাকে আরো শ্লোগান – তুমি কে? আমি কে? বাঙালি বাঙালি'; পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, পিন্ডি না ঢাকা? ঢাকা-ঢাকা; বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন কর; তোমার নেতা, আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব; ছয় দফা না এক দফা! এক দফা এক দফা'। বঙ্গবন্ধুর জেল থেকে মুক্তি লাভ এবং ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়। এ সময় আমরা নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই।

কিন্তু ক্লাস বেশীদূর এগোয় নি। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন, টানা ধর্মঘটে অচল হয়ে পড়ে স্কুলের স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম। কবে শেষবার স্কুলে গেছি মনে পড়ে না। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী চালায় নির্মম হত্যাযজ্ঞ। শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধ। মোহনগঞ্জে পাক সেনারা আসছে এরকম খবর ছড়িয়ে পড়লে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে মোহনগঞ্জ ত্যাগ করি ও আশ্রয় নেই দূরের গ্রাম মামার বাড়ী ধরমপাশায়। সেখান থেকে জুন মাসের কোন এক সময় ভরা বর্ষায় হাওড় পাড়ি দিয়ে নিকটবর্তী ভারতীয় সীমান্ত মেঘালয়ের মহেশখোলায় পৌছাই। সেখান থেকে দূর্গাপুরের সীমান্তবর্তী বাগমারা, সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর ওপার বাংলার নদীয়ার পায়রাডাঙ্গা গ্রাম।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। দেশে ফিরে আসার জন্য আমরা পাগল হয়ে উঠি। শিয়ালদহ থেকে গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হলে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আমরা মোহনগঞ্জে ফিরে আসি। সে ছিল এক আনন্দে ভরপুর রোমাঞ্চকর মূহুর্ত। আমাদের বাসাটি ছিল আধাবিধ্বস্ত, জীবন-জীবিকা কোন কিছুরই ঠিক-ঠিকানা ছিল না, তবু ও কষ্টের কোন অনুভূতি ছিল না। পরের দিন সকাল হতেই আমরা দুভাই দৌড়ে স্কুলে গেলাম। মোস্তাক সহ অনেক সহপাঠিদের সঙ্গে দেখা হলো। পরে অফিসে গিয়ে শুনলাম দশম শ্রেণীতে আমাদের অধ্যয়ন কাটছাঁট করে তিন মাসে সীমিত করা হয়েছে - নাম দেয়া হয়েছে "ওল্ড টেন", আমরা ঠাট্টা করে বলতাম বৃদ্ধ দশম। সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রম সংকুচিত করে মোট পাঁচটি বিষয় রাখা হয়েছে - বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান ; এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মোট ৩০০ নম্বরে – বাংলায় ৭৫ নম্বর, ইংরেজিতে ৭৫; গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান প্রতিটিতে ৫০ নম্বর। তিন মাস পর ক্লাস শেষ হয়ে গেল; বাকী সময় বাড়ীতে বসে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে (স্বাধীন বাংলাদেশে দ্বিতীয় এসএসসি ব্যাচ। আমাদের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল নেত্রকোনার চন্দ্রনাথ হাই স্কুলে। চরম অব্যবস্থাপনা ও ব্যাপক নকলবাজির মধ্য দিয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

MOHANGANJ PILOT HIGH SCHOOL
Estd. 1931.
P.O. Mohanganj.
DIST. MYMENSINGH.

বছর তারিখ — ইং ১৯৭২

নাম — ইন্দ্রজিৎ রায়

পিতার নাম — রাম লাল রায়

রোল নং ১৫০৬৬ বিজ্ঞান শাখা

১/ বাংলা — ৪৩

২/ ইংরেজী — ৫১

৩/ সা: গণিত — ৪৭

৪/ রসায়ন — ৪৭

৫/ পদার্থ বিদ্যা — ৪৪

২৩৮

* স্থান — প্রথম

[illegible]
Head master, Mohanganj
Pilot High School.
২৩/৩/৭৩

মো: হোসেন
২৩/৩/৭৩

এসএসসি পরী ক্ষার ফল প্রকাশ হয় মাস দুয়েক পর। মোট ৩০০ নম্বরে পাই ২৩৮ (৭৯.৩%), তিন সাবজেক্টে লেটার। এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো; অথচ স্বপ্ন ছিল ঢাকা বোর্ডে স্ট্যান্ড করার। উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার ইচ্ছা ছিল ময়মনসিংহের আনন্দমোহন সরকারী কলেজে। একদিন পত্রিকায় কলেজে ভর্তির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। ভর্তির আবেদনের জন্য প্রয়োজন বোর্ডের মার্কশীট, স্কুলে গেলাম। কিন্তু তখনো বোর্ডের মার্কশীট স্কুলে পৌছায় নি। প্রধান শিক্ষক শামসুল হক স্যার তখন একটি সাদা কাগজে প্রাপ্ত নম্বরগুলো লিখে সই করে দিলেন, এটি মার্কশীট হয়ে গেল (উপরের ছবি)। এক টুকরো কাগজ, এর বয়স ৫৩ বছর। তবুও পরম যত্নে রেখে দিয়েছি। কারণ শিক্ষা অর্জনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টায় এটি প্রথম দলিল। স্যার এটি সই করেছিলেন ১৯৭৩ সালের ২৩শে মার্চ। তাঁর হাত থেকে মার্কশীট টি নেয়ার পর আর স্কুলে যাওয়া হয়নি; খুব সম্ভবত এটি ছিল স্যারের সঙ্গে শেষ দেখা। এভাবেই পর্দা নেমে আসে আমাদের জীবন সংজ্ঞায়িত করার শুরুর ঐতিহাসিক কালপর্বটিতে: ১৯৬২ – ১৯৭২। শুরু পূর্ব পাকিস্তান দিয়ে এবং শেষ স্বাধীনতার ঊষালগ্নে। এ সময়ে আমরা যারা স্কুলে পড়েছি তারা ভাগ্যবান এই অর্থে, আমাদের দেখা ও অনুভব করার সুযোগ হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও এর স্ফূরণ, গণজাগরণ ও বাঙালি জাতিসত্বা-ভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়।